আমার বন্ধু শাহাদত

রফিকুন নবী

ছেলেবেলায় আমি থাকতাম নারিন্দার মনির হোসেন লেনে আর শাহাদত হাটখোলায়। কেমন করে যে পরস্পরকে চিনে ফেলেছিলাম তার খুঁটিনাটি এখন আর তেমন মনে নেই। তবে ঢাকা শহর তো তখন নিতান্তই ছোটখাটো। এ পাড়ার ছেলে ও পাড়ায়, ও স্কুলের ছেলে এ স্কুলে, মতিঝিলের সদ্য ইট ফেলা জমিগুলো দখল করে করে খেলার মাঠ বানিয়ে খেলা আর দাপিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়াবার কমন কর্মকান্ড ছিলো সবার। এসবের মাধ্যমেই পরিচয় ঘটতো একের সঙ্গে অন্যের। এক পড়ার ক্ষুদে গ্রুপের সঙ্গে অন্য পাড়ার। আর ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি। ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পাড়ায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে প্রায়শই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজক করতো প্রগতিশীল ছাত্র-জনতা। সে সবে গিয়ে পরিচয় হতো।

এমনি করে বইয়ের পোকা শেখ আব্দুর রহমান নয়ার (প্রয়াত) মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলাম শাহাদতের সঙ্গে বলে কিছুটা মনে পড়ছে।

শাহাদত, শীলব্রত চৌধুরী, শেখ রহমান, মবিন (প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান) এবং কবি বেগম সুফিয়া কামালের পুত্র শোয়েব (প্রয়াত) ছিল হরিহর আত্মা, জানি দোস্ত। এই চারজন একসঙ্গে ঘুরতো কিন্তু স্কুল ছিলো আলাদা। যেমনটা ছিলো আমারও।

শাহাদত, শীলব্রত এবং শেখ আবদুর রহমান ছিলো গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুলের ছাত্র। শেয়েব আর মবিন নওয়াবপুরের। আমি ছিলাম পগোজে। শেখ এবং শাহাদত ছিল তখনই বেশ ক্ষুদে ‘আঁতেল’ মতন। লেখালেখি করতো তখনই। যতদূর মনে পড়ে শাহাদতের ততদিনে গল্প ছাপা হয়ে গেছে কোনো দৈনিকের ছোটদের পাতায় । আমরা নারিন্দা পাড়ার ছেলেরা ছিলাম ডানপিটে। প্রায়শই দলবেঁধে এ পাড়ায় ও পাড়ায় গাছের ফল ফুলকে অ্যাটাক করে বেড়াই। অভয় দাশ লেনের তারাবাগের একটি বাগানেও তেমনি গিয়ে হানা দেয়ার চেষ্টা হতো প্রায়শই। এইখানে ছিলো শোয়েবদের বাসা। সেখানে যাতায়াত ছিলো শাহাদতদের চারজনের। আমি কিছুটা কাছে আসি এখানেও।

> তার ভগ্নিপতি প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিক্ষাবিদ শফিক হোসেন সাহেব শিল্পী হাশেম খান, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। আর সবার উপরে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যিনি অত্যন্ত স্নেহে ঠাট্টা করে শাহাদতকে পরবর্তীতে বলতেন, ‘আইডিয়া মাস্টার’

পরিচিত হবার পর আমাকে বইপত্রের খনি ঠাওর করতে শুরু করলো তখন ওরা সবাই। কারণ আমি তখন দেব-সাহিত্য কুটিরের পূজা সংখ্যা সংকলনসহ শুকতারা, শিশুসাথী ইত্যাদি পত্রিকা এবং অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলাসহ কয়েকটি বই, সুকুমার রায়, হেমেন রায়, শশধর দত্তের দস্যু মোহন, নীহার রঞ্জনের কালো ভ্রমরের বিভিন্ন খন্ড, শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির বইপত্র উপহার পাবার সুবাদে একচ্ছত্র মালিক।

এই সব নিয়ে আসা যাওয়ায় কখন সবাই ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই মনে নেই। পরবর্তীতে দাদাভাইয়ের কচি-কাঁচার মেলা দিয়ে ক্রমশ প্রতিদিনের আড্ডাবাজে পরিণত হয়ে যাই। বলা বাহুল্য, আমি ওই মেলার সক্রিয় সদস্য ছিলাম না কখনই, কিন্তু সক্রিয় আড্ডাবাজ হতে পেরেছিলাম শাহাদতের কারণে।

এমনি করেই একদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বড় হয়ে যাবার পালা আসে। সবাই স্কুলের ধাপ পেরিয়ে কলেজে গিয়ে ঢুকি যে যার পছন্দ মাফিক। আমি যাই আর্ট কলেজে। কিন্তু মন খারাপের দিক ছিলো যে, শুধু শাহাদত অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। সেই অনিয়মটায় পড়ে পিছিয়ে যায় অনেকখানি। পরের বছর পাশ করলেও লেখাপড়ায় অনভ্যাসে পেয়ে বসে তাকে। অতএব দূরে সরে যায় কয়েক বছরই।

> আমার বন্ধু শাহাদত চৌধুরী শাচৌ শেষতক চলে গেলেন আমাদের অনেক সমবয়সী আর সমসাময়িকদের ডিঙ্গিয়ে, পেছনে ফেলে। ব্যাপারটি সহজ নয়। তাঁকে নিয়ে লিখতে বলা হয়েছে। ‘অবিচুয়ারি’ লেখার ব্যাপারটি চিরকাল শাহাদত করতেন। তার মতো মর্মস্পর্শী করে সব অনুভূতিতে লেখায় উপস্থিত করতে আর কাউকে দেখিনি। মনে আছে আমাদের বন্ধু শেখ আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর মন খারাপ করা তাঁর অসাধারণ লেখাটির কথা।
>
> কিন্তু তাঁকে নিয়ে তেমন করে কে লিখবে? অতএব আমি সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। যা লিখলাম তা শুধুই দায়সারা।
>
> **রনবী**

তবে আড্ডা কমেনি। কচি-কাঁচার মেলা ছাড়িয়ে বড়দের আসরে ঠাঁই মিলতে শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাটা কাজের উপযোগিতা পেয়ে যায়। শুরু হয় বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকায় বসা। আমি তখন আর্ট কলেজের নিচু ক্লাশের ছাত্র হয়েও এ পত্রিকা সে পত্রিকায় টুকটাক ইলাস্ট্রেশান করে টু পাইস কামাই। একই সঙ্গে লেখা পড়ার অনীহাধারী শাহাদত লেখালেখি দিয়ে পারিশ্রমিক নিতে শুরু করেছে। উভয়েরই সেই উপার্জন খেলা খেলা মতন হলেও এবং যৎসামান্য হলেও তা নিয়ে উদ্দীপনার সীমা ছিলো না। নিজের পয়সায় নাজ সিনেমার ভালো ভালো ছবি দেখার টিকিট কিনতে পারা, পুরোনো বইয়ের দোকানে যখন খুশি তখন বই কেনা অথবা ভাড়া নেয়ার কাজ চলে যেতো খুব সহজেই এবং তা যে কী আনন্দের বোঝানো কঠিন। এইভাবে দোকানের হাল্কা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ছাপ মারা বই থেকে শুরু করে বড় বড় সাহিত্যের মধ্যে কখন যে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম তা নিজেরাই টের পাইনি। পড়তে পড়তে খেয়াল ছিলো কখন কখন মোটাসোটা বোরিং সব গ্রন্থও পড়া শুরু হয়। একবার তো শাহাদত রেগে কাঁই- আমার মাঝেসিনক্লেয়ারের ইয়া ঢাউস উপন্যাস কিনতে দেখে।

ষাট দশকের শুরুর এই দিনগুলোতে রাজনীতি নানান আন্দোলনে গরম হয়ে উঠছিলো। সেই সময় আমার সহপাঠী হাসান আহ্‌মেদের বদৌলতে সে সবের অনেক কিছুতে নাক গলাই আমি। মাঝে মাঝে শাহাদতকে সঙ্গী করি। ও তখন শুধুই লেখালেখি নিয়ে থাকে। রোম্যান্টিক ভাবনা চিন্তায় দিন কাটায়। খদ্দরের ঝরনা কাপড়ের বাদামী রঙের পাঞ্জাবীকে প্রায় ওর ট্রেড মার্ক করে তোলে।

কচি-কাঁচার মেলার সমবয়সী কিংবা ঈষৎ কনিষ্ঠ বয়সী মেয়েরা তখন বড় হয়েছে। এবং অনেকেই তার গুণাবলীতে আকৃষ্ট। অহরহ একতরফা প্রেমে পড়ছে। এই নিয়ে ওসবে বেশি না ঝুঁকেও বেশ গর্ব গর্ব ভাব দিয়ে আমাদের দিকে তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকায় তখন।

বলতে কী, আমরা মানে এই দলভুক্ত সবাই তখন বেশ পেকে গেছি নানাভাবে। ইন্টেলেকচুয়াল ভাব সবার। শাহাদত আবর তার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। ওই পাকামো জ্যেষ্ঠ অনেকের চোখেই পড়তো। তাঁদের কাছে ভালো ঠেকতো না বুঝতে পারতাম। অতএব আমরা এড়িয়েই চলতাম বড়দের।

রোকনুজ্জামান দাদাভাই শাহাদতকে সব চাইতে বেশি স্নেহ করতেন। যাঁর খুব কাছের ছিলো শাহাদত। অনেক দায়-দায়িত্ব দিয়ে রাখতেন তার ঘাড়ে। তো এক সময় দাদাভাইও অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেন সবার আঁতেলপনা চাল-চলন দেখে। শাহাদত সেই থেকে কচি কাঁচা নিয়ে মাথা ঘামানো কমিয়ে দেয়।

তো, চৌষট্টিতে আমি যখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখন প্রথম মজার ঘটনাটি ঘটলো। ও দুম করে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে গেলো। ভর্তির ব্যাপারটিতে আমার কিছুটা যোগসাজশ ছিলো বটে তবে তার ভগ্নিপতি প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিক্ষাবিদ শফিক হোসেন সাহেব শিল্পী হাশেম খান, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। আর সবার উপরে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যিনি অত্যন্ত স্নেহে ঠাট্টা করে শাহাদতকে পরবর্তীতে বলতেন, 'আইডিয়া মাস্টার'। তাতে আড্ডা দেয়াটা আমাদের আরো বাড়লো বই কমলো না। হয় আমার চিলেকোঠায় নয়তো ওর হাটখোলার বাসায়। ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ সালাপের আসর বসতো। বিষয় সিনেমা, বইপত্র, লেখালেখি। আর্ট-কালচার-রাজনীতি প্রেম প্রীতির ঘাই-ঘাপলা, সঙ্গীত ইত্যাদি হরেকরকম। অংশ গ্রহণকারী অন্যান্যদের মধ্যে নিয়মিত সদস্য ছিলো শীলব্রত চৌধুরী, শেখ আব্দুর রহমান।

মাঝে মধ্যে মন কষাকষি সবার সঙ্গে সবার। বিশেষ করে শেখ আব্দুর রহমানের সঙ্গে। তাতে পক্ষ- বিপক্ষ নেয়ার কারণে আমাদের সঙ্গেও ব্যাপারটা ঘটে যেতো। শাহাদত ছিলো একরোখা- জেদী। সিংহ রাশির জাতক বলে দারুণ গর্ব বোধ করতো। যদিও রাশিচক্রে বিশ্বাস করতো না মোটেও। যদিও অনেক সাল পরে জনপ্রিয় বিচিত্রার সম্পাদক থাকাকালীন সেই রাশিচক্রের বিশেষ সংখ্যা বের করার চল চালু করে পত্রিকার হাটে হৈ চৈ ফেলেছিলো শাহাদত। সে এক কান্ড! আমাকে বলেছিলো রাশি পড়ে পড়ে জাতকদের শরীর এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো এঁকে দিতে। আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে সে সব এঁকেছিলাম নিজের ইচ্ছা মাফিক। তা দেখে শাহাদত এ্যাতই মজা পেয়েছিলো যে- পরবর্তী বছরগুলিতেও বানিয়ে বানিয়ে তেমন সব আঁকতে হয়েছিলো বিশেষ অনুরোধে! তো এই পর্বে নিজের জেদকে জয়ী না করা পর্যন্ত সন্ধিতে আসতো না।

ব্যাপারটি শুধু বন্ধুদের বেলায়ই ঘটাতো তা নয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমে পড়লে তার সুচারু সমাপ্তি না দেখা পর্যন্ত বা সাফল্য না আসা পর্যন্ত ক্ষান্তি দিতো না। একটি উদাহরণ হতে পারে- ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় একটি ছড়া সংকলন বের করার জেদে পাওয়া। জেদ ছিলো দুজনেরই। কিন্তু ওর সিংহমার্কা জেদের সমান আমারটা ছিলো না যদিও। অতএব ওকে প্রাধান্য দিয়েই ঠিক হয়েছিলো- প্রতিষ্ঠিত কবিদের দিয়ে প্রয়োজনে লিখিয়ে নেয়া হবে। ও নিজে সম্পাদনা করবে আর আমি পুরো বইটার ছবি আঁকবো। কিন্তু কার ব্যানারে হবে? কোনো পাবলিশার রাজি হলো না। সাহস পেলো না কোনো পয়সাওয়ালা চেনা জানা ব্যক্তিরাও। তা ছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী ছড়াও বেশি পাওয়া যায়নি বইটির পৃষ্ঠা ভরাতে। সে এক মহা সঙ্কট! শাহাদত জেদ ধরলো যে বের করতেই হবে যেমন করেই হোক। জেদটি পরে সংক্রামিত হলো আমাদের মাঝেও ।

ধরা হলো সাপ্তাহিক ললনা পত্রিকার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আখতারকে (মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ডিসেম্বরে) তার প্রেসে ছাপিয়ে দেয়ার জন্যে এবং প্রকাশক হিসেবে আর্ট কলেজ ছাত্র সংসদকে ব্যবহার করা হবে। কারণ সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা তখন আমাদের, মানে শিক্ষকদের পাশাপাশি নানাভাবে আন্দোলনে সম্পৃক্ত। তাছাড়া ব্যাপার সেইফও। সরকারি ঝামেলা থেকে বাঁচতে। সবই ঠিক হলো। কিন্তু ছড়া? অতো ছড়া কই? শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ থেকে শুরু করে প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত কবিদের ছড়া পাবার পরও বহু পৃষ্ঠা শূন্য। বই তো আর বড় হবার উপায় ছিলো না। গদ্যের সেরা মানুষদের ধরা হলো শেষতক। শওকত ওসমান, সরদার জয়েনুদ্দিনসহ কেউ আর না দিয়ে পারলেন না।

তবুও এগোয় না। শাহাদত তার বিখ্যাত গোঁ-টি ধরে বসেলা যে, না বই বের করতেই হবে। এবং তারপরই মজাটা হলো। ছাত্রদের ডেকে হাতে কাগজ ধরিয়ে হুকুম দিলো- ছড়া লিখতে। তাও যে-সে ছড়া নয়- রাজনৈতিক ছড়া ছড়া লেখার রীতিমত কারখানা বসে গেলো ।

আমরাও লিখলাম। এমনকি মোহাম্মদ আখতারও না লিখে পারেননি। তখনকার কৃতী ছাত্র বীরেন সোম, মতলুব আলী, মঞ্জুরুল হাই চমৎকার ছড়া লিখে ফেললো । তাও পৃষ্ঠা ভরে না। অবশেষে আমার ছোটভাই যে তখন ছড়াকার হিসেবে সুপরিচিত তাকে প্রায় জোর করে শাহাদত বেশ কয়েকটি ছড়া লিখিয়ে নিয়েছিলো। জেদের ফসল সেই ছড়া সংকলন এখনও ঊনসত্তরের আন্দোলনের ওপর উল্লেখযোগ্য একটি প্রকাশনা। মনে আছে প্রচ্ছদের পয়সায় টানাটানি পড়েছিলো। বইয়ের যাবতীয় খরচ বহন করে আমারও পকেট শূন্য। তখন ইউসিসে গিয়ে নিতুন কুন্ডুর কাছ থেকে সিল্ক স্ক্রিনের জিনিস এনে কাজটি হয়েছিল। প্রচ্ছদ ছিলো নিতুন দার।

দ্বিতীয় মজার ঘটনাটি ঘটলো আমার হঠাৎ আর্ট কলেজের মাস্টার হয়ে যাওয়ায়। আমার ছাত্র হয়ে পাওয়া তখন যে তার কী নিদারুণ বিপত্তি! কেমন করে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে রাখবে তা নিয়ে ওর দুর্দশা দেখে আমি যে মজা পেতাম, তেমনি ওর সহাপাঠীরাও। কিন্তু তা ছিল শুধু ক্লাশ চলাকালীন। কলেজ থেকে বেরিয়েই আবার যেই কে-সেই। আমি শিক্ষক হবার পর

বিচিত্রা অফিসে সম্পাদকের টেবিলে

নিয়মিত আড্ডার জায়গা আরো একটি বেড়েছিল। তা হলো শিল্পী হাশেম খানের বাসা। সেখানে এসে যুক্ত হয়েছিলো আর এক শিক্ষক বুলবন ওসমান, ছড়াকার এখলাসউদ্দিন আহমেদ এবং কবি মাহবুব তালুকদার। কিন্তু আর্ট কলেজে এই সময় অন্য আরও এক বিপত্তিতে পড়ে আবার অনিয়মিত ছাত্র হয়ে পড়লো। ব্যাপারটির কারণ বয়সে অসম সহপাঠী। অনেক জুনিয়ারদের মধ্যে পড়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার অভ্যাসে পেয়ে বসলো তাকে। স্বভাবে তাল মেলাতে পারছিলো না মোটেও। এ নিয়ে আবার লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার উপক্রম।

এই পর্বে একদিন তার আম্মা আমাকে ডেকে বললেন, 'বাবা ও তো আবার কলেজে যাবার ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছে। বেলা করে ঘুমায়, অনিয়মে চলে। তোমাকে একটা দায়িত্ব দেই। তুমি প্রতিদিন সকালে কলেজে যাবার সময় ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যেও। ফেরার সময় আবার নিয়ে এসো'। খালাম্মার সেই কথাকে শিরোধার্য করে পরবর্তী বছরগুলোতে সেই কান্ড করেছি। প্রথম দিকে ব্যাপারটি খুব নির্বিঘ্ন হয়নি। বরং বলতে কি, ওর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে আমারই কলেজে যাওয়া দেরী হতে শুরু করেছিলো।

যাই হোক, পরে কলেজে নিয়মিত যাবার এবং নির্ধারিত সময়ে পাশ দিয়ে বের হবার ঘটনাটি ঘটায় আমিসহ সবাইই নিশ্চিন্ত হই। কলেজে পড়ুয়া শাহাদতকে ভালোবাসতো না এমন ছাত্র-শিক্ষক কেউ ছিলো না। বরং নানান কর্মকান্ডে পরামর্শ এবং যুক্ত হবার দিকটি ছিলো অপরিহার্য।

ষাট দশকের শেষে দেশ ক্রমশ গণআন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠলো। পশ্চিমাদের শাসন-শোষণ তখন হ-য-ব-র-ল। দাবিয়ে রাখার সব পন্থা আর পরিকল্পনা সামরিক শাসকদের জন্যে তখন বুমেরাং। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক গরম হাওয়া বইছে। তার আঁচ লাগে আর্ট কলেজেও। ছাত্র-ইউনিয়ন, সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগ ইত্যাদি ছাত্র সংগঠন বিপ্লবী কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলনের বৃহত্তর রাজনীতিকে সহায়তা দিচ্ছে তখন। আমাদেরও, অর্থাৎ শিল্পীদেরও সম্পৃক্ততা বাড়ে। শাহাদত ছাত্রদের সংগঠিত করে পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি নানান কাজে শিক্ষক এবং শিল্পী সমাজকে সহায়তা দিতে থাকে। উনষাট আর সত্তর সালে দুটি প্রতিবাদী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, কাল বৈশাখী এবং নবান্নের আয়োজনে শাহাদতের ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য তখনই সে সাপ্তাহিক ললনা। চিত্রিতা, রহস্য পত্রিকাসহ বেশ ক'টি কাগজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। একজন উঠতি সাংবাদিক হিসেবে ইতিমধ্যেই খ্যাতিমান। অতএব সেই সব কর্মকান্ডের আয়োজন তার অংশগ্রহণে সুষ্ঠু এবং সুচারুভাবে সম্পাদিত হতে পেরেছিলো বিশেষ সাংগঠনিক প্রজ্ঞার কারণে, সেই সঙ্গে প্রচারের দিকটিও। আসে একাত্তর। বদলে যায় দেশের সবকিছু। স্বাধীন হওয়ার জন্যে বিদ্রোহে নামে মানুষ। আসে যুদ্ধ। বদলে যায় দিনকাল। বদলে যায় শান্তিপ্রিয় বাঙালির শান্ত ছাপোষা স্বভাব। বদলায় শাহাদতও। চলে যায় যুদ্ধে। অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধা হয় খালেদ মোশাররফের তৈরি দুর্ধর্ষ সেক্টর-টুয়ের ক্র্যাক প্লাটুনে। ঘোর যুদ্ধে গেরিলা সেজে ঢাকায় আসে কোনো না কোনো অ্যাকশনের ভার নিয়ে দলেবলে। এলেই ঢাকায় তখনো বসবাসকারী আমি, শামসুর রাহমান, এখলাসউদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজনের বাড়িতে ওঠে ওষুধপাতি, জামা-কাপড় এবং অর্থের সাপ্লাই নিতে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে। জীবন বাজি রেখে চলাফেরা। সঙ্গে থাকতো শহীদুল্লাহ খান বাদল, ফতেহ্, হাবিবুল আলম, চুন্নুভাইসহ অনেকে।

অবাক হতাম দেখে যে, পা'জামা-পাঞ্জাবির ঢিলাঢালা শাহাদত তখন বদলে গিয়ে কী দারুণ স্মার্ট গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। সবাই দেখে যেমন আনন্দিত হতাম, তেমনি গর্বিতও। উৎকণ্ঠাও হতো খুব।

শাহাদত যুদ্ধে গিয়েও জুনিয়রদের কবলেই পড়ে গিয়েছিলো। ভেবেছিলাম এবারও বোধহয় বিপত্তিতে আছে। কিন্তু অভিভূত হয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, কনিষ্ঠযোদ্ধারা কী অসাধারণ শ্রদ্ধা, ভক্তি দিয়েই না তাকে কাছের করে নিয়েছিলো। যদিও আহ্লাদ করে ডাকতো 'বুড়ো' বলে। শাহাদতের কারণেই আমার আর মুক্তিযুদ্ধে ওদের সঙ্গে যাওয়া হয়নি। সেই না যাওয়ার আক্ষেপটি চিরকালই রয়ে গেলো। শাহাদত বলেছিলো, 'ঢাকায় থাকার প্রয়োজন আছে। সবাই চলে গেলে গেরিলারা আইসা কি পাকিস্তানিদের বাড়িতে উঠবো?'

খালেদ মোশাররফ বলেছেন, 'ঢাকায় নিজেদের লোক থাকা প্রয়োজন।'

খালেদ মোশাররফ ছিলেন যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-রবর্তীকালে তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধে প্রকৃত বীর কেমন হয়তার একটি ছক আঁকা ছিলো তার মনে মনে। সেইটির সঙ্গে যেন মিলে গিয়েছিলো এই সামরিক মানুষটির সবকিছু। ঠিক একইরকমটায় ছিলেন মেজর হায়দার।

স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বর্ণনাই ছিলো তার প্রিয় বিষয়। বারবার স্মরণ করতো শহীদদের। রুমী, আলতাফ ভাইসহ অনেকেকে বেগম জাহানারা ইমামের সহনশীলতাকে প্রতীক করে কেঁদেই ফেলতো। কাঁদতো যুদ্ধ করে পাওয়া স্বাধীন দেশের নানান দুর্দশা নিয়ে কথা বলতে গেলেও। এত বড় যুদ্ধ আর যুদ্ধ পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ এই এতকালে দেশ। এতো বছরের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির যে অভিজ্ঞতা তার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলতো ছেলেমানুষের মতো।

এই কেঁদে ফেলার মনটি ছিলো তার চিরকালের। আসলে বাইরের শাহাদত আর ভিতরের শাহাদতের মধ্যে তফাৎ ছিলো আকাশ-পাতাল। সেটুকু বুঝে নিতে হতো, বসে বসে হৈহৈ করে একনাগাড়ে কথা বলতে থাকা আর তার প্রিয় বাতিক সামনে কাগজ

ছিঁড়তে থাকা ব্যক্তিটি যে মনে মনে পরবর্তী ইস্যুর প্রচ্ছদ কাহিনী কিংবা আরো সিরিয়াস অন্য কোনো কথা ভাবতো তা বাইরে থেকে বোঝা সহজ ছিলো না। আর ছিলো কানকথায় বিশ্বাসী। দুর্মতিধারীরা এ বুদ্ধি খাটাতো নিজেদের স্বার্থে।

যাই হোক, স্বাধীনতার পর তার পরিচিতির পরিধি ব্যাপক হতে থাকে। সাপ্তাহিক বিচিত্রাকে কেন্দ্র করে, পত্রিকাকে জনপ্রিয় করা নিয়ে যতো ভাবনা। নিজেও খ্যাতিমান সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী হিসেবে। আমি সত্তরের দশকের শেষ দিকে বিদেশে শিল্পকলায় লেখাপড়া করে দেশে আসি। তিন বছরে শুধুই চিত্রকলা নিয়েই থাকায় কার্টুন বা ইলাস্ট্রেশনে আর মন বসাবো না স্থির করি। কিন্তু শাহাদত নাছোড়বান্দা। সেই সময় অনেক ভেবেচিন্তে টোকাই শুরু করি। শাহাদত টোকাইকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলে। দূরদর্শী সম্পাদক হিসেবে তার সুনাম তখন। অতএব টোকাইয়ে জনপ্রিয় হবে তা যেন জানতোই। কিছু ঘটনা থাকে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাপারটি নিয়ে আমি এবং শাহাদত মাঝেমধ্যেই আলাপ করতাম। এই যে আমার টোকাই আঁকার ভাবনা আসা। বিচিত্রার জনপ্রিয় হওয়া শাহাদতের সেই পত্রিকার সম্পাদনায় দায়িত্বে থাকা, দুজনের রুচির মিল হওয়া এবং টোকাইকে ছাপার বুদ্ধি স্মরণ করা ইত্যাদি এমনভাবে একত্রে ঘটে যে, মনে হয় তা বড় মন না হলে কিছুই হয়তো ঘটতো না। শেষদিকে এই কাকতালীয়তা নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে বলতো- দেশের অনেক কিছুই সাধারণ হিসাব-নিকাশের বাইরে। কার কী থাকার কথা আর কী হয়েছে। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে জড়িতদের নিয়েই এসব বলা।

তো, যা-ই হোক শাহাদত মুক্তিযুদ্ধ আর সহযোদ্ধাদের সাহচর্যেই মূলত যুদ্ধোত্তরকালে দিন কাটিয়েছে। তাদেরকেই আত্মীয়করন জ্ঞাতো। আপনজন ভেবেছে চিরকালই। তারাও তাই। এই বন্ধুরাই তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলো জীয়নকাঠি। মনোকষ্টটাও অতএব তাদেরই বেশি। এমনিতে বেঁচে থাকাকালীন কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়নি। হয়তো মরনোত্তরে গিয়ে কোনোদিন হবে, কিন্তু এই বন্ধুরা তার চিরবিদায়কে মহিমান্বিত করতে সরকার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট হাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাটুকু আদায় করে দিয়েছে। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা পরিবেষ্টিত ওই মর্যাদা প্রদান দেখে মনে হয়েছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই শহীদ সহযোদ্ধাকে বিদায় জানানো হলো।

তো শাহাদত সত্যি সত্যিই চলে গেলো। ভুগছিলো বহুদিন ধরেই। কিন্তু হার মানতে নারাজ হবার কারণে অসুখ নিয়েই কাজেকর্মে ডুবে ছিলো। কিন্তু বয়সটা সামাল দেয়া গেলো না। আসলে আমাদের সবারই বয়সটা বিপজ্জনক সময়ে এসে পৌঁছেছে। সমবয়সী প্রায় সবাই বাষট্টি পার করে তেষট্টিতে পা দিয়ে এগোচ্ছি। সুচারু দিনযাপনের এবং দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার পর্যায়টি এখন প্রায় সমাপ্তির পথে। মশকরা করে অতএব একে অপরকে বলি, গ্রেস পিরিয়ডে আছি।

এই কথাটি কদিন আগে শাহাদত চৌধুরীকে আমিও শুনিয়েছি। তখন সে ডা. কামরুজ্জামানের কম্যুনিটি হাসপাতালে কেবিনের খাটে শুয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু সবটাই রোগ-বালাইভিত্তিক। গল্প হচ্ছিল না মোটেই। তার গল্প মানেই পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া। শৈশব, কলেজ জীবন, বিভিন্ন দশকের সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, মুক্তিযুদ্ধ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা ইত্যাদিই ঘুরেফিরে বিষয় হতো। সেদিনই তাই হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু এই প্রথম তা আর হলো না। হালকা-পাতলা হয়ে যাওয়া শরীরটাকে টানটান করে শুয়ে থাকা দরিদ্র গোঁফওয়ালা বদলে যাওয়া অতি ক্লান্ত অন্য এক শাহাদত যেন কথা বলছিল।

আমার সঙ্গে ছিল শাহাদতের অত্যন্ত প্রিয় একজন, শিল্পী আবুল বারক আলভী। শাহাদত বললো ‘মিয়া, সময় মনে হয় কইমা আসতাছে। আর ভালো লাগে না। এখন হাসপাতালটাই প্রায় বাড়ি। এই কেবিন, এই বিছানা ডাক্তার, নার্স এসব নিয়াই আছি। ঘুমাইয়াই থাকি প্রায় সারাদিন ওষুধ খাইয়া। একেবারে কাষ্ঠখণ্ডের জীবন। কাজকর্ম নাই, ভাবনা-চিন্তা বলতে শুধু রোগ আর ওষুধপাতির কথা।’ খুশি করতে পুরনো বুদ্ধি ধরে বললাম, ‘তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো। কইষা আড্ডা দিই, নতুন কিছু প্ল্যান- প্রোগাম করি চলো।

মুচকি হেসে তাকিয়ে রইলো ছাদের দিকে। তক্ষুনি কোনো উত্তর ছিলো না। অনেকক্ষণ পর বললো- ‘আমার তো এখন আর কোনো গল্প নাই, ঘটনা নাই, চিন্তা-ভাবনাও করি না কোনো কিছু নিয়া। অসুখেই অভ্যস্ত হইয়া গেছি। কোনো মানে হয়?’ একরাশ নৈরাশ্য নিয়ে প্রশ্ন করে।

এসবের কী উত্তর দিবো? একটা সদাব্যস্ত মানুষের পক্ষে ওই নির্জীব শুয়ে থাকা কী চাট্টিখানি কথা। এসব নিয়ে আলাপক অতএব আর বাড়তে দেয়া উচিত নয় যখন ভাবছি, তখন শাহাদত নিজেই বিষয়ের ধরনটি পাল্টে দিলো। বললো, ‘তোমার ছেলে টুটুল বউ নিয়া আমার বোন মরিয়মের বাসায় দাওয়াত খাইতে গেছিলো লন্ডনে। কী দ্রুত দিন যায়। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। তোমার ছেলে তখন পিচ্চি। আমার বিয়েতে নতুন বউ সেলিনাকে দেইখা বলেছিলো, ‘আকাশের মতো সুন্দর’। বলে হাসলো’।

সেলিনার কথা উঠতেই জিজ্ঞেস করলাম কখন আসে হাসপাতালে। বলতে না বলতেই দরজা ঠেলে সেলিনা স্বয়ং উপস্থিত।

রোগী দেখার ব্যাপারে আমার একটি বদ-স্বভাব আছে। আমি নিজেই তা বুঝি। কিন্তু অস্বস্তি দূর করতে আমি সে অভ্যাস ত্যাগও করতে পারি না। স্বভাবটি আর কিছুই নয়- অহেতুকই হাস্যরস মিশিয়ে কথা বলা, এই ধারণায় যে তা শুনে রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কিন্তু এই ওষুধটা একমাত্র শাহাদত ছাড়া আর কারো কাছে প্রশংসা পায়নি। কী বলে হাসিয়েছিলাম তা আর পুরোটা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। তবে শেষটুকু ছিলো এই রকম যে, ‘তাড়াতাড়ি সাইরা-সুইরা বাসায় ফিরো। তারপর জীবনের আমাগো গ্রেস পিরিয়ডটা একটু হৈ-ফুর্তিতে কাটাই চলো। এই ডিস্‌গ্রেস্‌ড্ লাইফটারে একটু গ্রেসফুল করি গিয়া।

এসব কথায় হেসে বলেছিলো, ‘মিয়া, তুমি একই রকম আছো। বদলাইলা না। শোন- সিস্টাররে একটা কাগজ দিতে কও। এশা বায়না ধরচে একটা টোকাই আঁইকা দিতে যেন তোমারে বলি।’ কথাটা শুনে যাচাই করার চেষ্টা করছিলাম যে, বায়নাটা কতোটুকু কন্যা এশার আর কতোটুকু তার নিজের। কারণ, টোকাইয়ের প্রতি তার অদ্ভুত এক ধরনের টান ছিলো, যাকে অবসেশনও বলা যায়। এতটাই যে আমার আঁকা ওই পিচ্চি চরিত্রটাকে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান করে তোলার জন্যে বিচিত্রাকে নানাভাবেই ব্যবহার করে ছিলো। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই একটি করে টোকাই এঁকে নেওয়াটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বলা চলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডা. জামান এবং ডা. রত্না এসে হাজির হয়েছিলেন কেবিনে রুটিন চেক-আপে। সঙ্গে ঢুকেছিলেন তার প্রিয় শিষ্য, মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা বিশিষ্ট নাট্যজন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

ডাক্তার-নার্সদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনের আবহাওয়া রোগ এবং রোগী-সংক্রান্ত হয়ে উঠলো। লক্ষ্য করলাম নিজের চিকিৎসা এবং করণীয় নিয়ে ডাক্তারদের নিজেই পরামর্শ দেয়া শুরু করেছে। এমনসব জ্ঞানগর্ভ ডাক্তারি কথা যে, কে কার রোগী বোঝা ভার। ডাক্তাররা হাসছিলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে ডাক্তার বলেছিলেন, ‘শাহাদত ভাই নিজের অবস্থাকে যতটা খারাপ ভাবছেন ততটা নয়। ইচ্ছে করলে বাড়িতেও থাকতে পারেন। কিন্তু ওষুধপথ্য খাইয়ে টানা রেস্টে রাখার জন্যেই এখানে। এমনিতে ভালো আছেন। অতোটা ফ্যাটাল নয়, এখনো ভাবনা-চিন্তাটা করেন বেশি।

এসব শুনে নিশ্চিন্তে বিদায় নিয়ে চলে

এসেছিলাম। ভেবেছিলাম সারা বছর যেভাবে একটার পর একটা অসুখে ঘরবন্দি- এবার বোধহয় আরোগ্যটা দীর্ঘস্থায়িত্ব পাবে।

দিল্লিতে চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার আগে বলতো- 'এমন অবস্থা যে মরেও যেতে পারি।' তো সেটা সত্যি হলো কয়েক বছর পর। সেই শেষ দেখা। শুনেছিলাম ক'দিন পরেই বাসায় ফিরে এসেছিলো। আজ যাবো, কাল যাবো করে আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু হঠাৎই ডাক্তারের কথা মিথ্যে করে দিয়ে জীবনের অমোঘ ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেললো। চলে গেলো বিদায় নিয়ে চিরতরের জন্য। বারডেমে মুমূর্ষু শাহাদতকে আমার দেখার সাহস হয়নি। তার যাবার আগের ক'দিন চলে গেলো আমার সবচাইতে। কাছের বাল্যবন্ধুটি যে ছিলো আমার পরম হিতৈষী গুণগ্রাহী অথচ আবার গুণবিচারী কড়া সমালোচক। চলে গেলো একসঙ্গে বেড়ে ওঠা, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গী এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা গুলজার করা শ্রেষ্ঠ বন্ধুটি।

দেশের নানান উত্থান-পতনের সাক্ষী অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা দেশের বিভিন্ন গুরুতর সংকটে সদা বিচলিত এবং তা নিরসনে নিজস্ব সৃজনশীল ভাবনাচিন্তা দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার বিশাল কর্মী শাচৌ চলে গেলো দেশের সাম্প্রতিক দুঃসময়ে যখন তার মতো দুঃসাহসী যোদ্ধা মৌলবাদবিরোধী সোচ্চার মানুষদের প্রয়োজন, ঠিক তক্ষুনি।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তারুণ্যকে উদ্দীপ্ত করার সংগঠক আধুনিক জীবনকে, জীবন-যাপনকে যুগোপযোগী এবং সৌন্দর্যময় করে গড়ে তোলার পরামর্শক এবং আয়োজক ও চর্চাকারী শাহাদত চৌধুরী বিদায় নিলো যখন তার মতো করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে এসব সর্বত্র ঠিক তখন।

সংবাদপত্রকে জনপ্রিয় করে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছানো, দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত রুচিশীল পাঠক তৈরি এবং সাংবাদিকতাকে বীরোচিত পৌঁছানো ও মান-মর্যাদায় আকর্ষণীয় করে তোলার কারিগর এবং শিল্পী শাহাদত চলে গেলো বাকি সৃজনশীল ভাবনাচিন্তাগুলোকে অসমাপ্ত রেখেই।

চারুকলার ডিগ্রিধারী শিল্পী হয়ে বিশাল মাপের রাজনীতি-সচেতন সাংবাদিক, সৃজনশীল লেখক, সংগঠক, সংস্কারক: সম্পাদক হওয়াসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অথচ প্রচারণাবিমুখ নিরহঙ্কার মানুষ হওয়ার মতো অনেক গুণের অধিকারী শাহাদত চৌধুরী নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিলো আরো অনেক প্রাপ্তিকে অসম্পূর্ণ রেখেই।

আমরা শাহাদত নামের ব্যক্তিটিকে হারালাম, ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিকে হারালাম। তা তো দুঃখ জাগানিয়া বটেই কিন্তু আসল ক্ষতিটা তো হয়ে গেলো একজন একক প্রতিষ্ঠানকে হারিয়ে। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়, জন্ম-জন্মান্তরেও।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনায়

মাহফুজ আনাম

শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতে। আমি সেসময় সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক। তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন সক্রিয়কর্মী। বিশেষ করে ৬৮-৬৯-এর দিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো। এভাবেই ওনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।

প্রথমত তিনি একজন চিত্রশিল্পী। শিল্পী হিসেবেই তাঁর হাতেখড়ি। এ সময়েই আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তিনি দেখেন একটি জাতির মুক্তির স্পৃহা কতো গভীর হতে পারে। এবং মুক্তির সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি জাতি কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তিনি দেখেন ব্যক্তির অসীম সাহসিকতা ও সমষ্টির অনতিক্রম প্রতিরোধব্যূহ কীভাবে একটি জাতিকে তিল তিল করে তার অভীষ্ট লক্ষ্য স্বাধীনতার স্বর্ণ শিকড়ে পৌঁছে দেয়। শিল্প এবং যুদ্ধ এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর সাংবাদিকতায় প্রবেশ। আমার মনে হয় এই অভিজ্ঞতাই তাঁর একজন সম্পাদক হিসেবে সফল হওয়ার নেপথ্য ভিত্তি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও তার শিল্পী জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় যোগদান করলেন। বিচিত্রার উন্মেষের ক্ষেত্রে পুরো অবদান এই সম্পাদকের। বিচিত্রার মধ্যদিয়ে তিনি রীতিমতো একটি বিপ্লবসাধন করলেন। প্রথমত একজন সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ববোধ, এবং সেই দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে সমাজের নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি উন্মোচন করা- এ কাজগুলো তিনি যারপরনাই দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

বলতে গেলে তখনকার সময়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রা যে একটি নিজস্ব অবয়ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তা শাহাদত চৌধুরীর এক অনন্য সৃষ্টি। সমাজ উন্নয়নে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চেতনাবোধের সংস্কার সাধনে একটি সাপ্তাহিক

> ২০০০ ও আনন্দধারা বের করতে গিয়ে তাঁর খুব কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়েছিল। তখন খুব কাছ থেকে তাঁর সৃজনশীলতার প্রমাণ পেয়েছি। বিশেষ করে ২০০০-এর বলিষ্ঠ প্রচ্ছদ কাহিনীর কথা না বললেই নয়। তাঁর সম্পাদনা, অসাধারণ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে সংবাদ উপস্থাপন ইত্যাদি কারণে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকমনে স্থায়ী জায়গা করে নেয়

পত্রিকাও যে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে তা আমাদের কাছে অজানা ছিল। তিনি সেটি করে দেখিয়েছেন। কিন্তু কাজটা তিনি এতো সফলভাবে করলেন কী করে? এমন সফলতার জন্য আমি বলবো তার পেছনে দুটো জিনিস কাজ করেছে। এক হলো তাঁর শিল্পীমন আরেক হলো তাঁর যোদ্ধামন। পরস্পর দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর সাংবাদিকতায় প্রবেশ। এটাকে আমার কাছে একটা টার্নিং পয়েন্ট মনে হয়। তিনি একহাতে রঙের তুলি রেখে অন্য হাতে স্টেনগান চালিয়েছেন। ফলে তাঁর ভেতরে শিল্পী সত্তাটি যেমন প্রবল ছিল তেমনি প্রবল ছিল এই সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তোলার প্রবল বাসনা।

নতুন নতুন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী অনায়াসে এদের স্থান করে দেয়া ছিলো তার সবচেয়ে বড় অবদান। তাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত ও প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে বিচিত্রা। বর্তমানের বড় বড় লেখকরা কোনো না কোনোভাবে বিচিত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

বলা যায় একা তাঁর হাত ধরেই দেশে বর্তমানে ফ্যাশন এবং ফ্যাশন ডিজাইন বলে একটা শিল্প দাঁড়িয়ে গেছে। আনন্দ বিচিত্রা ও বিচিত্রার মাধ্যমে পাঠকের কাছে অপরিচিত এই বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তারাও এই শিল্পটিতে অল্প সময়ের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর এখন ফ্যাশন তো এক বিশাল শিল্প। একটা ছোট্ট উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমি ফ্যাশন শিল্পে তাঁর প্রভাব যে কতখানি ছিল তা উল্লেখ করছি। যেমন আগে আমরা 'পাঞ্জাবি' পরতাম। তখন পাঞ্জাবি বলতে সাধারণত 'সাদা' বা 'ঘিয়ে' রঙের পাঞ্জাবিকেই বুঝাতো। আর এখন কতো হাজার ধরনের ডিজাইনের কোর্তার যে হয় তার হিসেব নেই। পোশাক-আশাকসহ প্রাত্যহিক জীবন যাপনেও রঙ বা নকশার যে বিশাল প্রভাব থাকতে পারে তা তিনিই প্রথম দেখালেন। তিনি তাঁর পত্রিকায় এগুলো নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করেছেন, ঈদ বাজার পরিক্রমা বের করেছেন। এ রকম আরো অসংখ্য সৃষ্টিশীল আইডিয়া দিয়ে আমাদের পাঠক-মানসকে প্রভাবিত করেছেন। ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো জন, জীবনের স্বাধ, রুচির বিশাল একটা অংশকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন। আর এসবই সম্ভব হয়েছে তাঁর শিল্পী মনের কারণে। তাই আমার কাছে মনে হয় তিনি হলেন সৌন্দর্যের নিখুঁত বোধসম্পন্ন কলমযোদ্ধা, কবি মানসের সাংবাদিক।

সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারা'র ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

বিচিত্রার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিনোদন বক্তব্য ছিলো। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে এরশাদের পতন পর্যন্ত যেসব ঘটনা রয়েছে এগুলো কিন্তু বিচিত্রার মধ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তখন নানা বৈরিতা, প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ইস্যুটিকে মানুষের সামনে নিয়ে এসেছেন তিনি, এতেই তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নবীনদের সচেতন করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। সাম্প্রদায়িক শক্তির, বিশেষ করে জামায়াতের বিরুদ্ধে তিনি কাজ করেছেন। তাদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন, '৭১-এ তাদের ভূমিকা বেশ জোরালোভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।

২০০০ ও আনন্দধারা বের করতে গিয়ে তাঁর খুব কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়েছিল। তখন খুব কাছ থেকে তাঁর সৃজনশীলতার প্রমাণ পেয়েছি। বিশেষ করে ২০০০-এর বলিষ্ঠ প্রচ্ছদ কাহিনীর কথা না বললেই নয়। তাঁর সম্পাদনা, অসাধারণ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে সংবাদ উপস্থাপন ইত্যাদি কারণে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকমনে স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

সংবাদ ও সংবাদ সংক্রান্ত আইডিয়ার ব্যাপারে তাকে গুরু না মেনে উপায় নেই। অবশ্য গুরুশিষ্য ব্যাপারটা একটু বেশি বলা হয়ে যায়। কারণ আমি তার শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখি না। অত্যন্ত সম্মান করতাম তাঁকে। তাঁর অসুস্থতা আমাকে প্রচন্ড পীড়া দিত। তাঁর শারীরিক ক্রমাবনতি আমার মাঝে একটা বেদনার ছায়া ফেলতো। এবং বুঝতে পারছিলাম যে একটা অবধারিত পরিণতির দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন।

আমি আর শাহাদত ভাই একসঙ্গে একবারই বিদেশে গিয়েছিলাম। আমেরিকাতে ফোবানা সম্মেলনে তিনি দাওয়াত পেলেন, আমিও দাওয়াত পেলাম। নিউইয়র্কে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম, অগণিত লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। যদি ১০০ লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো তার মধ্যে ১ জন হয়তো আসতো আমার কাছে। বাকি ৯৯ জন আসতো তাঁর কাছে। তখন আমি স্বচোখে দেখার সুযোগ পেলাম যে বিদেশের মাটিতেও শাহাদত ভাইয়ের কী ব্যাপক পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা। এদের মধ্যে আছে ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে ওয়ালস্ট্রিটের ব্যবসায়ী। নিশ্চয়ই তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে শাহাদত চৌধুরী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বা তাদের প্রত্যেকের জীবন কোনো না কোনোভাবে শাহাদত চৌধুরী স্পর্শ করে গেছেন।

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। এখন আমাদের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ। ২০০০ ও আনন্দধারার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, পাঠকদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়াতে হবে। যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো তাঁর কীর্তিকে পূর্ণ মর্যাদায় টিকিয়ে রাখা। সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারা হলো শাহাদত চৌধুরীর বিশাল কীর্তি। আমাদের চেষ্টা থাকবে তাঁর এই কীর্তিকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। আমাদের প্রতিজ্ঞা, আর এ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আমি মনে করি তবেই শাহাদত চৌধুরীর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হবে।

আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শাহাদত চৌধুরী ও বিচিত্রার সময়

মুনতাসীর মামুন

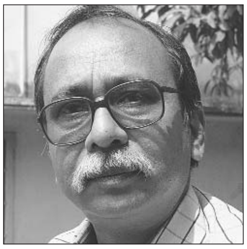

বাংলাদেশের তখন সুসময়। বাংলাদেশের তখন দুঃসময়। ১৯৬৮ শেষ হবে হবে, ১৯৬৯-এর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তারপর যে সময়টা এলো তা দেখার সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়? সে জন্যই ছিল সুসময়। এতো বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র মনোভঙ্গির মানুষ আর কখনও এমনভাবে যূথবদ্ধ হয়নি। এরপর তো হঠাৎই চলে এলো ১৯৭১। আর সে সময়ই শাহাদত চৌধুরী ওরফে শাচৌ বা শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তখন মফস্বল থেকে আসা ছাত্র। পড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে। যোগাযোগটা বেশি কচি কাঁচার আসর (ইত্তেফাক) ও সাতভাই চম্পার (দৈনিক বাংলা) সঙ্গে। আমাদের জেনারেশনের যারা লেখালেখি করছি, শাহরিয়ার কবির, আলী ইমাম, বেবী মওদুদ, আজমিরী ওয়ারেস- আরো অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, কর্ম পরিধি, চেনাজানার পরিধি বাড়ছে। সকালে বাসা থেকে একবারে বেরুই, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকা অফিস, ঘোরাঘুরি করে ফিরি সন্ধ্যায়। তবে, শাহরিয়ার আর আলী ইমামের পরিচিতি ও চেনাশোনার পরিধিটি ছিল বেশি।

শাহাদত ভাই, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান খান এদের অন্য গ্রুপ। আমাদের বেশ সিনিয়র। প্রধানত শিল্পী গ্রুপ তারা। কিন্তু জুনিয়র লেখক গ্রুপ আর সিনিয়র শিল্পী/ লেখক গ্রুপের মধ্যে একটা যোগসূত্র হয়েছিল। কারণ ঐ সময় লেখালেখি, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জোয়ার। শিল্পী-সাহিত্যিক সিনিয়র- জুনিয়র সব একাকার। এই সময়ই আমার সঙ্গে এঁদের পরিচয়। এর মধ্যে হাশেম খানই ছিলেন আমার মুখ চেনা, কারণ ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তিনি।

মহিলাদের জন্য 'ললনা' নামে একটি পত্রিকা তখন বেরুতো সেগুনবাগিচা থেকে। সম্পাদক ও মালিক সত্যি সত্যিই মহিলা বটে, কিন্তু সমস্ত কাজ পুরুষদের। এর মধ্যমণি ছিলেন আখতার ভাই যিনি ১৯৭১ সালে শহীদ হন। শাহরিয়ারই আমাকে 'ললনা' অফিস নিয়ে গিয়েছিল। আগের থেকেই যুক্ত ছিল সে। আর ছিলেন হাশেম খান ও শাহাদত চৌধুরী। শাহরিয়ার শুধু আমাকে নয়, আমাদের গ্রুপের সবাইকেই নিয়ে জড়ো করেছিল 'ললনা'তে। সে সময় 'ললনা' খুবই সাড়া জাগিয়েছিল। শুধু মহিলাদের জন্য প্রকাশিত আর কোনো পত্রিকা এতো সাড়া জাগায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস সেরে আমরা জড়ো হতাম সেগুনবাগিচার 'ললনা'য়। সেগুনবাগিচা তখন শহরে মধ্যে হয়েও শহরতলি। 'ললনা'য় লেখা, আড্ডা মেরে কখনও কখনও পাশেই কাজী আনোয়ার হোসেনের প্রেসে। তিনি তখন মাসুদ রানা বের করেন। শাহাদত ভাই কাজী আনোয়ারেরও ভক্ত। কখনও কখনও সেগুন বাগিচার মোড়ে হাশেম মিয়ার পুরনো বইয়ের দোকান ঘেটে বাড়ি ফেরা। সেগুন বাগিচার খালটা তখনও ছিল। পরে চোখের সামনে এটা দখল হয়ে যায়।

'ললনা'র সঙ্গে আমরা যুক্ত কিন্তু অন্যান্য পত্রিকায়ও হানা দিই। মনে আছে, রুমানা মামুন নামে তখন অনেক লেখা লিখেছিলাম। এ সময় 'রানার' নামে একটি পত্রিকাও বের হয়েছিল বেনজীর আহমদের সম্পাদনায়। তার সঙ্গেও এ গ্রুপ জড়িত ছিল। এলো ১৯৭১। আমরা সবাই ছিটকে পড়লাম।

শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের পরিচয় শুরু স্বাধীনতার পরপর। বিশ্ববিদ্যালয় আবার শুরু হয়েছে। শাহাদত ভাই তখন খুব সম্ভব দু একটা সাময়িক পত্রের সঙ্গে জড়িত। মনে পড়ে, আবিদুর রহমান তখন 'গণবাংলা' বের করছেন। সে অফিস তখন গমগম করত। হাশেম খান, একদিন রিকশা থেকে শাহাদত চৌধুরীকে নামিয়ে গণবাংলায় সংস্কৃতি পৃষ্ঠার সম্পাদক বানিয়ে দিলেন। আমারও সেখানে স্টাফ রিপোর্টার হওয়ার কথা চলছিল। ঘোরাঘুরি করছি। আবিদুর রহমান কাজ করতে বলছেন। নিয়োগপত্র দিচ্ছেন না। নিয়োগপত্র চেয়েছিলাম। খানিকটা রুষ্ট হয়েছিলেন এতে। পয়সাঅলাদের ব্যাপারই আলাদা। তারপর আর সেখানে যাইনি।

শোক বইতে স্বাক্ষর

দৈনিক বাংলার প্রকাশনা হিসেবে প্রথম বেরিয়েছিল বোধহয় মাসিক বিচিত্রা। ফজল শাহাবুদ্দীনের সম্পাদনায়। তারপর পাক্ষিক বিচিত্রা। শাহাদত ভাই সেখানে চলে গেলেন। সেটি ১৯৭২/৭৩ হবে। সেখানে শাহরিয়ার, আহরার, আজমিরী ছিল। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম। এরিমধ্যে ঠিক হলো বিচিত্রা 'স্ট্রাস্টে'র অধীনে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে আমি দৈনিক বাংলার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। কাজ করব সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। এখন এর দায়িত্বে কে থাকবে তা নিয়ে একটা টানাপোড়েন শুরু হলো। ফজল শাহাবুদ্দীনের দাবিই ছিল প্রথম। কিন্তু, তরুণরা চেয়েছিল শাহাদত চৌধুরীকে। এর অর্থ এ নয় যে, ফজল শাহাবুদ্দীনকে অপছন্দ করত তরুণরা। আমাদের বন্ধু আজমিরীই তো তাঁকে পরে বিয়ে

করে। আসলে শাহাদত ভাই মুক্তিযুদ্ধ ফেরত, টগবগে তরুণ, আর্টিকুলেট, আমরা আগেও তার সঙ্গে কাজ করেছি সুতরাং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি। ফজল শাহাবুদ্দীন তো অনেক সিনিয়র।

তখন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক। তিনিই ঠিক করবেন কে ভার নেবে বিচিত্রার। ফজল শাহাবুদ্দীন, পাটোয়ারী সাহেবের সহকর্মী অনেক দিনের। দু'জন আবার স্নেহও করেন শাহাদত ভাইকে। কিন্তু স্নেহই তো সব নয়। নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল আমাদের। শাহরিয়ার বুদ্ধি দিল, লবিং করতে হবে। পাটোয়ারী সাহেবকে বলতে হবে। আত্মীয়তা থাকলেও তো আমি বলতে পারি না। কারণ আমাদের ব্যবধানটা অনেক বড়। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ফুপাতো বোনের স্বামী নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। তিনি আমার চাচা। সুতরাং শাহরিয়ার আর আমি গিয়ে প্রাথমিক লবিং করলাম বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কাছে। তারপর শাহাদত ভাইকে নিয়ে গেলাম তার বাসায়। শাহরিয়ার, আমি, শাহাদত ভাই কথা বললাম তার সঙ্গে। ঠিক হলো বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, যাকে আমি জাহাঙ্গীর চাচা বলি তিনিই পাটোয়ারী সাহেবকে বোঝাবেন। আমাদের মূল থিম ছিল, নতুনভাবে সাপ্তাহিক বেরুবে, এখন তরুণদের সময়, তারুণ্যের প্রতীক শাহাদত চৌধুরী। সুতরাং, তাকে ছাড়া 'বিচিত্রা' নবযাত্রা করবে কীভাবে?

আমাদের লবিং সফল হলো। নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী সম্পাদনায় বিচিত্রা যাত্রা শুরু করলো। সার্কুলেশনের দায়িত্ব পেলেন আব্দুল মালেক। আর পুরো পত্রিকার দেখাশোনার দায়িত্ব শাহাদত চৌধুরীর। তিনি সহকারী সম্পাদক। এর সঙ্গে যুক্ত হলো পুরনো বিচিত্রা থেকে শাহরিয়ার আর মাহফুজউল্লাহ। যুক্ত হলাম নতুন আমি। তারপর শেখ আবদুর রহমান, সাযযাদ কাদির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, চন্দন সরকার। কেউ আগে, কেউ পরে জয়েন করেছিলেন।

সে সময় বিচিত্রা কীভাবে বেরুতো তা আজ কল্পনা করা যাবে না। আমরা নবিস কয়েকজন কর্মী। লেখা সংগ্রহ, লেখা, সম্পাদনা করা সব আমাদের ঘাড়ে। তারপর লাইনো টাইপে কম্পোজ। পত্রিকা কীভাবে ছেপে, বাঁধাই হবে তার একটি রীতি উদ্ভাবন করেছিল শাহরিয়ার ও শাহাদত ভাই। এসব ব্যাপারে মাথা খুলতো শাহরিয়ারের বেশি। কম্পোজ ম্যাটার থেকে ছাপ নেয়া হতো সেলোফেনে। তারপর শাহরিয়ার বা শাহাদত ভাইয়ের ছক অনুযায়ী টেবিলে ফর্মা সাজিয়ে সেই সেলোফেন কেটে কেটে লাগানো হতো। মুখ্য পেস্টার ছিলেন আহমদ আলী। আর ফটোগ্রাফার ছিলেন আল মাজি। মোটামুটি দুপুরের আগে পেস্টিং শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতো। দুপুরে বিরিয়ানী বা রুটি-চাপ। রাতে প্লেট করে ছাপা হতো। এভাবে শাহাদত ভাইয়ের কাছে আমরা হাতে কলমে কাজ শিখেছি।

প্রথমদিকে বিচিত্রা কোনো চরিত্র পায়নি। নিজস্ব চরিত্র পেতে একটু সময় লেগেছে। একদিন জনাব পাটোয়ারী শাহাদত ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে আমিও আছি। তখন তিনি প্রস্তাব করলেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদ করতে। প্রতি সপ্তাহের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনই প্রাথমিকভাবে বিচিত্রার চরিত্র ঠিক করে দিলো।

প্রায় প্রতিদিনই শাহাদত ভাইয়ের ছোট ঘরে একটা সময় আমরা যেতাম। প্রচ্ছদ কাহিনী কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা হতো। অধিকাংশ সময় বিচিত্রার কর্মীরাই প্রচ্ছদ কাহিনী লিখতেন। পরবর্তীকালে বাইরের কেউ কেউ লিখে দিতেন। আস্তে আস্তে আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিভাগগুলো ঠিক হতে লাগলো। এর কিছু আইডিয়া আমাদের, কিছু শাহাদত ভাইয়ের। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কখনও, না শাহাদত ভাই না আমরা কোনো কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতিদিনই নতুন নতুন আইডিয়া মাথায় খেলা করতো, শাহাদত ভাইয়ের সামনে হয়তো সেটা বললাম। কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে তিনি তা শুনতেন। পছন্দ হলে বলতেন, শুরু করো। না হলে আবারও আলোচনা।

বিচিত্রার চারিত্র্য এনে দিয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু বিভাগ। শাহাদত ভাই একদিন বললেন, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন চালু করলে কেমন হয়? আইডিয়াটা তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন এবং আমাদের নির্দেশ দিলেন একটা করে বিজ্ঞাপন লিখতে। প্রথম সংখ্যার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনগুলো আমাদেরই লেখা। এবং প্রথম থেকেই এটি হিট।

আমাদের একদিন ডেকে বললেন, মাঝখানের দু'পাতায় বিভিন্ন ছোট ছোট খবর দিয়ে একটি ফিচার করতে। টাইম নিউজ উইক যেটি করে। সেই থেকে নিয়মিত পড়া শুরু হলো 'টাইম', 'নিউজ উইক' যা এখনও অব্যাহত। তখন তো আর ইন্টারনেট ছিল না। সারা সপ্তাহ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ম্যাটার সংগ্রহ করে লিখতাম 'এখানে সেখানে'। দশ বছর তা লিখেছি। তারপর এলো বছরের আলোচিত চরিত্র। সেটি সুপার হিট। আলোচিত চরিত্রটি প্রধানত শাহাদত ভাই-ই ঠিক করতেন, পরে তা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বছরের আলোচিত চরিত্র কী হবে তা নিয়ে ডিসেম্বরেই পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের সাসপেন্স তৈরি হতো।

এখন সময় শিল্পী রফিকুন নবী ফিরলেন গ্রিস থেকে। শাহাদত ভাই বললেন আমাকে, 'নবীর একটা ইন্টারভিউ নিয়ে এসো।' গেলাম রফিকুন নবীর কাছে। ছোট সাক্ষাৎকার ছাপা হলো। নবী ভাই আসা শুরু করলেন বিচিত্রায়। জন্ম হলো 'টোকাই'র। নতুন মাত্রা পেল বিচিত্রা। সেই থেকে রফিকুন নবী আমাদের প্রিয় নবী ভাই হয়ে গেলেন এবং যতদিন বিচিত্রা ছিল ততদিন নবীভাই জড়িয়ে ছিলেন বিচিত্রার সঙ্গে।

শিল্পী হিসেবে চিত্রকলার প্রতি শাহাদত ভাইয়ের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। পড়াশোনাও ছিল যথেষ্ট। সামনে সেই সময় যারা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিলেন তাদের পড়াশোনাটা ছিল। শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার প্রধান যোগসূত্র ছিল চিত্রকলা ও বই। এ পরিপ্রেক্ষিতেই একদিন তিনি বললেন, শিল্পী কামরুল হাসানের ওপর একটা কভার স্টোরি করব। তুমি যাও দেখা করো তার সঙ্গে। কামরুল হাসান তখন বিসিকে। শিক্ষানবীস আমি গেলাম তাঁর কাছে। কয়েকদিন যেতে হলো তার কাছে। আপন করার এক দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমি তাঁর অচেনা কিন্তু মনে হতো তিনি চেনেন আমাকে বহুদিন। তাঁর সমস্ত ছবি গুছোবার দায়িত্ব পেলাম। কভার স্টোরি হলো। কোনো শিল্পীর ওপর বাংলাদেশে সে ধরনের কভার স্টোরি প্রথম। ঐ যে শিল্পী কামরুল হাসানের ঘনিষ্ঠ হলাম তা অটুট ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর জীবনের অনেক টানাপোড়নের কাহিনী আমার জানা। সেটি লিখতে গেলে আরেক মহাভারত হয়ে যাবে। তারপর শিল্পী মুর্তজা বশীর, সুলতান, কাইয়ুম চৌধুরী অনেকের ওপর প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম। সে সময় প্রস্তাব করলাম প্রতি সপ্তাহে শিল্পকলা ও বইয়ের ওপর একটি করে কলাম থাক। বললেন, লিখবে কে? 'আমি'। জবাব দিলাম। রাজি হলেন। যুক্ত হলো দুটি নতুন আইটেম। দীর্ঘদিন এ দুটি বিষয়ে আমি লিখেছি। সমালোচনা হোক না হোক চিত্র সমালোচনা করেই যেতাম। পরে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে মতান্তরের কারণে সেটি লেখা বন্ধ করে দিই।

ঈদ সংখ্যা বের করার আইডিয়াটা শাহাদত ভাইয়ের। সেটি ছিল পত্রিকা জগতে বিস্ফোরণ। ব্যাপারটা এক সময় এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, বিচিত্রার ঈদ সংখ্যায় লেখা প্রকাশ না হলে অনেকে মুষড়ে পড়তেন। উপন্যাস কি কি যাবে তা ঠিক করতো শাহরিয়ার আর শাহাদত ভাই। তিন চার মাস জুড়ে চলতো এই আয়োজন। প্রতি বছরের সালতামামি নিয়ে বইপত্র বের করার কৃতিত্বও শাহাদত ভাইয়ের। এর মূল দায়িত্বে থাকতেন বিচিত্রার নীরব কর্মী চন্দন সরকার। একই ভাবে শুরু হলো বিচিত্রার পাঠকদের জন্য 'পাঠক ফোরাম'। প্রবাসীদের জন্য 'প্রবাসীর পাতা'। একই ভাবে 'জীবন যে রকম' (নামটা ঠিক মনে নেই) বিভাগটির দায়িত্বও আমাকে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে, তরুণ ব্যারিস্টার, বর্তমান মন্ত্রী নাজমুল হুদাকে অনুরোধ করেছিলাম 'পকেট আইন' লিখতে। রাজিও হয়েছিলেন তিনি। ফ্যাশন নিয়ে শুরু

হলো নতুন কার্যক্রম। খুব সম্ভব চিন্ময় ছিল এর দায়িত্বে। পরে শামীম আজাদ।

এভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি একটি করে বিভাগ চালু হলো। বিচিত্রার একটি চরিত্র দাঁড়িয়ে গেল। সবদিক থেকে বিচিত্রা হয়ে দাঁড়াল আগে প্রকাশিত সব ধরনের সাপ্তাহিক থেকে আলাদা।

শাহাদত ভাই পত্রিকার নিত্যদিনের কাজ দেখাশোনা করতেন তা নয়। এর দায়িত্ব প্রধানত ছিল শাহরিয়ারের। শাহাদত ভাই সকাল ১০/১১ টার দিকে অফিস আসতেন। টেবিলের সামনে থাকত একটা নিউজ প্রিন্ট প্যাড। তিনি সকাল থেকে কাগজ ছেঁড়া শুরু করতেন। কখনও কখনও আমাদের ডেকে পাঠাতেন। অথবা লেখক, শিল্পী, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। বিচিত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছিল লেখক, শিল্পীদের একটি কেন্দ্র। শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকর্মী চলচ্চিত্রকর্মী সবার মাঝে মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছিল বিচিত্রা, শাহাদত ভাই। এ সময় বাংলাদেশে এমন কোনো নামী লেখক ছিল না যার লেখা ছাপা হয়নি বিচিত্রায়। তরুণ লেখকদের লেখা ছাপায়ও কোনো কার্পণ্য ছিল না পত্রিকার। আজকের প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকের হাতে খড়ি বিচিত্রায়। মনে পড়ে, জাফর ইকবালের প্রথম গল্পটি বোধহয় ছাপা হয় বিচিত্রায় এবং তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা তখন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করেছি। সারাদিনে নানা কাজকর্মের মাঝেই পত্রিকা কিভাবে ভালো করা যায় সে চিন্তাই ঘুরতো। একবার খেয়াল আছে, উয়ারী বটেশ্বর সম্পর্কে জেনে আমি, আল মাজি আর আহমেদ নূরে আলম রওয়ানা হয়ে যাই নরসিংদীর বেলাব। যাতায়াত অবস্থা খুব খারাপ ছিল। দীর্ঘ পথ হেঁটে পৌঁছেছিলাম বেলাব। সেখানে রাত্রিযাপন করে পরদিন দুপুরে ফিরে তার পরদিন প্রচ্ছদ কাহিনী লিখে জমা দিয়েছিলাম। আহমেদ নূরে আলম রিপোর্ট করেছিলেন দৈনিক বাংলায়। বিচিত্রার আরেক সম্পদ ছিলেন আল মাজি।

ব্যক্তিগতভাবে বিচিত্রা থেকে আমি পেয়েছি প্রচুর। হাতে কলমে কাজ শিখেছি। শাহাদত ভাইয়ের আগ্রহে ইতিহাস জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি শুরু করি। বুড়িগঙ্গা রক্ষার আন্দোলন আমরাই শুরু করেছিলাম। ঢাকা নগর জাদুঘরের সূত্রপাত সেখান থেকেই। বিচিত্র সব বিষয়ে লিখেছি। আমার অনেক গল্প ছাপা হয়েছে তখন বিচিত্রায়। বিচিত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিচিত হয়ে উঠছিলাম। আর চেনা জজানার পরিধিও বেড়েছিল যথেষ্ট।

২

বিচিত্রার কাজের মাধ্যমেই শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আজ পেছন ফিরে মনে হয়, কাজ ছাড়া সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। কাজই যোগসূত্র। শাহাদত ভাইয়ের কারণে তাঁর পরিবারের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শাহাদত ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট বোন ডানার সঙ্গে বিয়ে হয় শাহরিয়ারের। ঘটকালি করেছিলেন জাহানাা ইমাম। শাহাদত ভাই গোপনে আমার মতামত জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছিলাম, 'এমন ছেলে পাওয়া দুস্কর'। শাহাদত ভাইয়ের বাসায় নববর্ষের পার্টি ছিল এক আনন্দময় ব্যাপার। তিনি যখন বিয়ে করেন তখন তাঁকে সাজিয়ে আমরা কয়েকজন নিয়ে গিয়েছিলাম বিয়ের আসরে, ফায়ার ব্রিগেড সদর দপ্তরে। ভালোবাসতেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের গল্প করতে। জাহানারা ইমামের প্রিয় ছিলেন তিনি। জাহানারা ইমামের ব্যক্তিগত দুঃসময়ে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে বিকেলে যেতেন তার বাসায় গল্প করতে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল তার জীবনের কেন্দ্রে। ১৯৭৫ সাল সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানতেন। কিছু কিছু বলেছিলেনও। পুরোটা কখনও বলেননি, জানতেও চাইনি।

বই নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো প্রচুর। বই আদান প্রদানও চলত। একবার হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' উপন্যাসটি আমি নিয়েছিলাম তার কাছ থেকে পড়ার জন্য। ত্রিশ বছর পরেও আমাকে বলেছিলেন, বইটা তুমি ফেরত দিলা না। বললাম, ভুলে যান সে কথা। মনে করেন আমার কাছেই আছে।

একটি ঘটনার কথা প্রায়ই আমাকে তিনি মনে করিয়ে দিতেন। একবার শাহরিয়ার, মাহফুজ উল্লাহ কী কারণে যেন ধর্মঘট করল। বেতনগত কোনো সমস্যা নিয়ে বোধহয়। শাহাদত ভাই রাগেননি কিন্তু অসহায় বোধ করছিলেন। বাকি ছিলাম আমি। তখন বোধহয় আমরা তিনজনই ফুলটাইম ছিলাম। তিনচার সংখ্যা আমি আর শাহাদত ভাই বের করেছিলাম। শাহরিয়ার- মাহফুজউল্লাহ অফিসে আসত, গল্প করত, আমাদের অবস্থা দেখে মিটি মিটি হাসত, কিন্তু পত্রিকা বন্ধ হয়নি। পরে সব মিটমাট হয়ে যায়।

১৯৭৪ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। পার্ট টাইম থেকে যাই বিচিত্রায়। সেই পার্ট টাইম ফুল টাইমের মতোই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টা কাটতো বিচিত্রায়। ইতিমধ্যে শাহাদত ভাই ভারপ্রাপ্ত থেকে পুরো সম্পাদক হয়েছেন। শাহরিয়ার সহকারী বা বোধহয় নির্বাহী সম্পাদক। পুরনো আমরা অনেকে চলে গেছি, নতুনরা এসেছে। নতুনদের জন্য দ্বার সব সময় অবারিত ছিল বিচিত্রার।

একটানা দশ বছর ছিলাম বিচিত্রায়। তারপর একটি কারণে তার সঙ্গে আমার মতান্তর হয়। মনান্তরও বলা যেতে পারে। আমি বিচিত্রা ছেড়ে দিই। রাগ করিনি, কারণ একটি মোহের কাছে পরাজিত হয়ে কাজটি তিনি করেছেন, কিন্তু না করলেও পারতেন। ব্যাপারটা এমন কোনো জটিল বিষয় ছিল না। অভিমান খানিকটা হয়েছিল এ ভেবে যে, এতোদিনের শ্রম, ঘনিষ্ঠতা কোনো কিছুকেই তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। সে সময় এবং পরবর্তীকালের 'জনকণ্ঠে'র একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছে, কেউ ক্ষমতাবান হলে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। সেখানে তখন অনেক বিষয়ই কাজ করে না। শাহরিয়ারের সঙ্গেও মতান্তর হয়েছিল। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা পরে তাঁকে চাকরিচ্যুত করলেন যে বিচিত্রা তাকে প্রথম পরিচিতি দিয়েছিল। সেই যে আমি বেরুলাম বিচিত্রা ছেড়ে আর কখনও পা দিইনি বিচিত্রায়। মাঝে মাঝে হয়ত লিখতাম।

প্রথম এক যুগের বিচিত্রা দেখলে বোঝা যাবে কতো বিচিত্র বিষয় সব প্রচ্ছদে এসেছে। পাঠকের মনে কী কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, পাঠকের ভাবনাকে উসকে দিচ্ছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও 'বিচিত্রা' বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল বিচিত্রা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, শাহাদত ভাই থেকে শুরু করে বিচিত্রার কোনো কর্মী কোনো ধরনের সুবিধা নেননি কখনও। হয়ত, বিচিত্রার সম্পাদক বা কর্মীরা অনুভব করেননি যে তারা ক্ষমতাবান। হয়ত এ কারণে বিচিত্রা টিকে ছিল দীর্ঘদিন।

বিচিত্রা জনপ্রিয় হয়েছিল কেন? কারণ, বিচিত্রা তার সময়কে ধরতে পেরেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশের জন্য আমাদের কিছু করার আকুতি। স্বাধীন দেশের দিগন্ত ছিল প্রসারিত। পাঠকদের মনও প্রসারিত করতে পেরেছিল বিচিত্রা। বিচিত্রার পাঠক, কর্মী, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী সবাই মিলে বিচিত্রা গড়েছে, একটি ইন্সটিটিউশনে পরিণত করেছে আর এর নেতৃত্বে ছিলেন শাহাদত চৌধুরী।

৩

বিচিত্রা থেকে চলে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হ্রাস পেয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানাবিধ বিষয়। মাঝে মাঝে পার্টিতে বা কোথাও দেখা হতো। বুঝতাম তিনি কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছেন। নিজেই কথা বলতাম, তারপর সহজ হয়ে উঠতেন। ঐ ব্যাপারটা অনেক আগেই চুকেবুকে গিয়েছিল, হয়ত তিনি বুঝেছিলেন অমন করা ঠিক হয়নি, তাই অস্বস্তি। আমরা পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতাম। তিনি তখন সম্পাদক, বিচিত্রাও প্রধান সাপ্তাহিক, নতুন নতুন কর্মীর সব ভিড় কিন্তু তবুও মনে হতো প্রথম যুগের কর্মীদের সঙ্গে তিনি যেরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, পরবর্তীকালের কর্মীদের সঙ্গে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি।

দেখা সাক্ষাৎ না হলেও পরস্পরের খোঁজ রাখতাম। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ বিনষ্ট হয়নি।

কারণ, প্রথম যুগের কর্মীদের মধ্যে বয়সে ছিলাম আমিই কনিষ্ঠ। শুনেছি, আমার প্রসঙ্গ উঠলে কখনও তিনি বিরূপ মন্তব্য করেননি, সস্নেহ প্রশংসা করেছেন। এক ধরনের সরলতা ছিল তার মধ্যে। উপযাচক হয়ে কারো ক্ষতি তিনি করেননি। একবার লন্ডনেও আমরা কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম, বলা যেতে সময় উপভোগ করেছিলাম। নানা বিষয়ে তার কৌতুহল আমাদের উদ্দীপ্ত করত। আমি যে ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করছি বা অন্য বিষয়ে, তার জন্য আমি তাঁর কাছে এখনও কৃতজ্ঞ। তিনি ছিলেন আমাদের জেনারেশনের নায়ক।

শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার শেষ দেখা মাস দুয়েক আগে। তিনি তখন কমিউনিটি হাসপাতালে। আমার স্ত্রীও সেখানে। রাতে ভাবলাম তাকে একবার দেখে যাই যদিও দেখা করা বারণ। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, ‘শাহাদত ভাই আসব?’ সেই ইনোসেন্ট হাসি হেসে বললেন ‘না’। সেলিনা ভাবী তখন তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। জীর্ণ শরীরে অসহায়ের মতো বসে ছিলেন ইনভ্যালিড চেয়ারে। তিনি চাইতেন না তাঁর এ অবস্থা কেউ দেখুক। আমি বললাম, ‘ভেতরে যাব না। এখান থেকেই দেখি আপনাকে?’

তিনি কিন্তু ততোক্ষণে কথা শুরু করে দিয়েছেন, মিনিট পাঁচেক পর আমি বললাম, ‘যথেষ্ট হয়েছে, শাহাদত ভাই, এখন যাই।’ বললেন, ‘শোন, সাপ্তাহিক ২০০০-এ আসিফ নজরুলকে বলেছিলাম ঘটনাটি লিখতে। সে বোধহয় লেখেনি।’

বললাম, ‘কোন ঘটনা?’

‘ঐ যে, মনে নেই তোমার’ আবার সেই হাসি।

‘শাহরিয়ার আর মাহফুজউল্লাহ স্ট্রাইক করলো, আমি আর তুমি মিলে একমাস পত্রিকা বের করলাম।’

তুমি চলে গেছো কিন্তু যাওনিও তো!

আলী যাকের

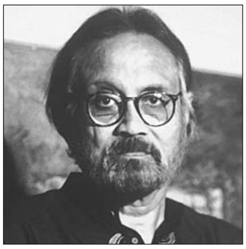

শাহাদত চলে গেলো। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই বাল্যকালে, যখন ১২ নম্বর অভয় দাস লেনে আমার খালাবাড়ির সামনে বিশাল আঙিনায় শামীম ভাইয়ের নেতৃত্বে ‘বেজ বল’ খেলা শিখছি। শামীম ভাই হলেন বেগম সুফিয়া কামালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহেদ কামাল। সদ্যই আমি এসেছি মফস্বল শহর থেকে বাবার বদলি সূত্রে। শরীর থেকে তখনও গ্রাম্য গন্ধটা উঠে যায়নি। সেই থেকে গত পঞ্চাশ-একান্ন বছর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে আমাদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে কিংবা চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি। নানা ব্যাপারে অট্টহাসিতে একসঙ্গে ফেটে পড়েছি আমরা দুজন, আবার কখনো কোনো বিষয়ে প্রচন্ড তর্ক বেধেছে আমাদের মধ্যে। আমরা যারা শিক্ষিত মানুষ, তাদের সম্পর্ক তো এই রকমই হয়। একমত অথবা দ্বিমত হলেও এর পেছনে মুক্তি থাকে। বন্ধুতা ক্ষুণ্ন হয় না। আমার ও শাহাদতের সম্পর্ক ছিল অনেকটা সেই রকম। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ যখন স্বাধীন হলো, তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গত ৩৪ বছর ধরে এই বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে। এ নিয়ে আমরা কেউ-ই উচ্চকিত ছিলাম না। লোকদেখানোর কোনো বিষয় ছিল না এর মধ্যে। তবু জানতাম, আমরা নির্ভর করতে পারি একে অন্যের ওপর।

শাহাদত চলে যাবার পর বিচিত্রার অনেক পুরনো একটা সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। এই পত্রিকাটি বস্তুত পক্ষে শাহাদতের প্রথম এবং প্রধান সাফল্য। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, বোধ এবং বুদ্ধির এক অসাধারণ সমন্বয়। আমার ব্যক্তিগত মতে, একটি সাময়িকী কেমন হওয়া উচিত তা আমাদের শিখিয়েছে শাহাদত চৌধুরী। এখন ভাবা যায় যে একটি সাময়িকীতে নিয়মিত লিখছেন চিন্ময় মুৎসুদ্দি, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন। লিখছেন ‘বিশপ হেবারে’র লেখায় ঢাকার বর্ণনা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের ওপর বিশ্লেষণী লেখা বেরুচ্ছে জাহানারা ইমামের কলাম থেকে। একসঙ্গে এতোগুলো বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান মানুষ বিচিত্রাকে ঘিরে ছিলেন তখন। কত অসাধারণ কবিতা, বিশ্লেষণী লেখা, সমালোচনা, গল্প এবং প্রতিবেদন আমরা পেতাম প্রতি সপ্তাহে বিচিত্রার পাতায় পাতায়। আর রনবী’র আঁকা টোকাই। সেও তো শাহাদতেরই প্রচেষ্টায় সমগ্র বাংলাদেশের বিবেক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর সময়ের আবর্তে বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেলো। শাহাদতের সম্পাদনায় এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলো ‘সাপ্তাহিক ২০০০’ ও ‘আনন্দধারা’। অনুসন্ধানী লেখা, বিনোদনের সঙ্গে রুচিবোধের সমন্বয়, আধুনিকতার সঙ্গে অতীতের স্বর্ণপ্রভা, আজকের সঙ্গে ভবিষ্যতের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করার প্রচেষ্টায় শাহাদত চৌধুরী নিয়েছিলেন সতত অগ্রণী ভূমিকা। তাঁর উত্তরসূরি কেউ কি আছেন যারা শাহাদতের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর পতাকাটি তুলে ধরবেন? আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন তোমায় বন্ধু। তুমি চলে গেছো কিন্তু যাওনিও তো। তোমার তৈরি সব মানুষের মাঝে, তোমার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার মধ্য দিয়ে তুমি আছো এবং থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত। তুমি ছিলে চোখে, এখন ঠাঁই করে নিয়েছো আমাদের সবার হৃদয়ে। জয়তু শাহাদত চৌধুরী।

শাহাদত চৌধুরী ও আলী যাকের